পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ—

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের শিল্পরীতি

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের শিল্পরীতি

'উপন্যাস' জীবনের সামগ্রিক রূপের দর্পণ। উপন্যাসে আমরা চলমান জীবনের ছবিটিকেই রূপায়িত হতে দেখি। সমালোচক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় জানিয়েছেন যে, উপন্যাসে — " কল্পনা যতই কমনীয় হোক তাহাকে ঘটনাসম্ভাব্যতা মানিয়া চলিতেই হইবে।" [১] বস্তুত, 'উপন্যাস' রূপকথার গল্প নয়। একালের উপন্যাসে অনেক সময় 'ঘটনাসম্ভাব্যতা' বিঘ্নিত হলেও 'বাস্তবতা' যে উপন্যাস রচনার অন্যতম শর্ত— এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু, একথাও অনস্বীকার্য যে, 'উপন্যাস' বাস্তবজীবন-নির্ভর হলেও, শুধুমাত্র বাস্তবজীবনের ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই—তা 'উপন্যাস' হয় না— " উপন্যাস সাংবাদিকের বিবরণ নয়, সত্যের অন্তর্দীপ্ত সন্দর্ভ।" [২] প্রকৃতপক্ষে মানব জীবন বড়ো রহস্যময়,এমনকি— জীবন নানা রূপময়ও বটে। রহস্যময় ও রূপময় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সহজ নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, জীবনের খুব কাছাকাছি থাকলেই বোধহয় 'জীবন'-এর ছবিটিকে পূর্ণাঙ্গ স্বরূপে দেখা যায়। কিন্তু, এ ধারণা ঠিক নয়। একজন খেলোয়াড় যেমন খেলায় অংশগ্রহণ করেও পুরো খেলাটাকে উপভোগ করতে পারে না, তেমনি প্রতিটি মানুষ তার প্রাত্যহিক দিনযাপনের ভিতরে থেকে, জীবনের নানাবিধ জটিলতা সম্পূর্ণত উপলব্ধি করতে পারে না। তবে, নানা প্রকার সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে 'উপন্যাস' ই সবচেয়ে বেশি জীবনঘনিষ্ঠ। 'উপন্যাস' মানুষের জীবনসত্যের অন্তর্গূঢ় রহস্যটিকেই শিল্পের আয়নায় প্রতিবিম্বিত করে দেখায়। উপন্যাসের পাঠক তার প্রাত্যহিক দিনযাপনের অবসরে উপন্যাসের মধ্যেই খুঁজে পায় জীবনসত্যের প্রকৃত রূপটিকে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, উপন্যাসের ক্ষেত্রটি কিন্তু একজন মানুষের জীবনক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। কেননা— মানুষের জীবন তো সীমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্ষণকালের অধিবাসী একজন মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনের সামগ্রিক তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু, 'উপন্যাস' মানুষের ব্যক্তিগত সীমায়িত জীবনের মধ্যেও এক বিস্তৃত, বৃহত্তর জীবনবোধের সন্ধান দেয়। একালের একজন খ্যাতনামা সমালোচক বিষয়টিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন —

> প্রত্যেক উপন্যাস একটি স্বতন্ত্র মানব সংসার, স্বতন্ত্র জীবনখণ্ড। ইচ্ছা করলেই পাঠক অনায়াসে লেখকের হাত ধরে মানব অভিজ্ঞতার নানান ভুবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে বেড়াতে পারেন। ইচ্ছা করলেই পাঠক আলালের ঘরের দুলালের মতিলাল হতে পারেন, ইচ্ছা করলেই সীতারাম হয়ে নিজের স্ত্রীর প্রতি উন্মত্ত আকর্ষণে রাজ্য হারাতে পারেন। ... উপন্যাস খুলে বসলেই তিনি অচলা হয়ে একবার প্রশান্ত, স্থির মহিমের প্রান্তে, আর একবার দুরন্ত, অস্থির সুরেশের প্রান্তে নিষ্ঠুর দোলনে দুলতে পারেন, অপু হয়ে দিদির সঙ্গে ছুটতে ছুটতে মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ধাবমান রেলগাড়ির দিকে পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে পারেন, কুবের হয়ে বিস্তীর্ণ পদ্মায় জেলে নৌকো নিয়ে ইলিশ মাছ ধরতে পারেন এবং পরস্ত্রী কপিলার জন্য আকুল হয়ে হঠাৎ তাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিতে পারেন ... সমস্ত সম্ভাব্য জীবনে পাঠকের প্রবেশ অবারিত। উপন্যাস মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অবাধ সম্প্রসারণ। [৩]

একথাও ঠিক যে, জীবনসত্যের অন্তর্দীপ্ত কাহিনিকে উপন্যাসের রূপ দিতে হলে ঔপন্যাসিককে কোনও না কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হয়। এখানেই উপন্যাসের 'আঙ্গিক' বা শিল্পরূপের কথা এসে পড়ে। সঙ্গত কারণেই উপন্যাসের শিল্পোৎকর্ষতার বিচারে একদিকে যেমন লক্ষ করতে হয় মানুষের জীবনের ছবিটিকে তার নিহিত সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, অন্যদিকে—তার প্রকাশরূপটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'প্রসঙ্গ' এবং 'আঙ্গিক'-এর প্রকৃষ্ট মেলবন্ধন ছাড়া কোনো সৃষ্টিই বিশুদ্ধ শিল্প জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে পারে না।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের শিল্পরূপের বিশিষ্টতা তুলে ধরে, তাঁর রচিত উপন্যাসাবলীর শিল্পসার্থকতার দিকটিকে তুলে ধরাই বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের শিল্পগত দিকটির আলোচনায় প্রথমেই আমাদের নজরে পড়ে উপন্যাসের আখ্যানাংশ নির্মাণে ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতা। ঔপন্যাসিক রমাপদ তাঁর উপন্যাসে প্রচলিত রীতির প্লট বা বৃত্তেরই অনুকারী। সরল এবং যৌগিক প্লটকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। 'আরো একজন', 'পরাজিত সম্রাট', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে', 'খারিজ','লজ্জা','হৃদয়','বীজ' প্রভৃতি উপন্যাসে একটি মাত্র কাহিনিই উপস্থাপিত হয়েছে। 'আরো একজন' উপন্যাসে দেখা যায়— একালের নরনারীদের অনেকেই একজনকে ভালোবেসে তৃপ্ত নয়, সে প্রেম যতই শান্ত, গভীর,উষ্ণ আর উন্মত্ত হোক না কেন। নারী-পুরুষের এই বহুগামিতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে আলোচ্য উপন্যাসটিতে নায়ক কমলেশের বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্ত্রী সুনন্দা এবং হাসপাতালের নার্স ছন্দাকে নিয়ে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এবং উপন্যাস কাহিনির শেষে সন্তানের প্রতি অপত্য স্নেহের মধ্য দিয়ে কিভাবে সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে—এই কাহিনিকেই সরল প্লটের বিন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন প্রবীণ অধ্যাপক অনুপমের জীবনে তাঁর বিগতপ্রায় যৌবনের ভুলে যাওয়া রোম্যান্টিক প্রেম। বাস্তবের কঠিন আঘাতে এই প্রেম কিভাবে ভেঙে গেল—এই সরলীকৃত কাহিনিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'পরাজিত সম্রাট', 'খারিজ', 'লজ্জা', 'হৃদয়', 'বীজ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিও উপকাহিনি বর্জিত—প্লটের বিন্যাস সরল পথে অগ্রসর হয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, রমাপদ চৌধুরীর এই উপন্যাসগুলির প্লট সরল হলেও বিষয়বস্তু কিন্তু অত্যন্ত ভাব-গম্ভীর। বিষয়ের গভীরতার কারণেই এই উপন্যাসগুলি উন্নত শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে। ঔপন্যাসিক রমাপদ যৌগিক বৃত্তের প্লট নির্মাণেও স্বচ্ছন্দ। উদাহরণ হিসেবে 'আকাশপ্রদীপ', 'শেষের সীমানা' উপন্যাস দুটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'আকাশপ্রদীপ' উপন্যাসে ক্রমশ বদলে যাওয়া শহর কলকাতার প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত মানুষের আশ্রয় সমস্যা,জীবন-সংকটের বিষয়টিকে কয়েকটি পরিবারের কাহিনির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আবার— মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-সঙ্কটের বিপ্রতীপে বস্তিবাসী মানুষের জীবন যন্ত্রণার দিকটিকেও উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক অসাধারণ মুন্সীয়ানায় সবগুলি পরিবারের কাহিনিকে যেমন এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে গোটা পাড়াটিকেই নায়ক করে তুলেছেন, তেমনি তথাকথিত এই ভদ্র পাড়ার মানুষদের জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন বস্তিবাসীদের জীবনযন্ত্রণা। বস্তিবাসী মানুষদের তুলনায় তথাকথিত রুচিশীল শিষ্ট সমাজের মানুষেরা যে স্বভাবধর্মে খুব একটা পৃথক নয়—ঔপন্যাসিক এদের সকলকে এক করে দিয়ে যৌগিক প্লটের বৃত্তটিকে পূর্ণতা দান করেছেন। 'শেষের সীমানা' উপন্যাসে একটি মূল কাহিনির পাশাপাশি তিনটি পরিবারের তিনটি পৃথক সমস্যা তিনটি উপকাহিনির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপন্যাসের শেষে মধ্যবিত্ত মানুষের সার্বিক অসহায়তা এবং অসহায়তা থেকে পরিত্রাণের জন্য সকলেই অলৌকিকের কামনা করেছে। এভাবেই উপন্যাসের যৌগিক বৃত্তটি পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্লট নির্মাণে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির অনুসারী হলেও তাঁর উপন্যাসে গল্প বা আখ্যানভাগের মধ্যে স্পষ্ট দুটি স্তর রয়েছে—

> এই চেনাজানা সমাজেরই কিছু চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে-কাহিনী গড়ে ওঠে, তার মধ্যে কোথাও কোন ঘটনার ঘনঘটা থাকে না। যা ঘটে তাও আমাদের অচেনা নয়। এই সব চরিত্ররা কখনও নাটকীয় চরিত্র হয়ে ওঠে না, উচ্চরব আমার অপছন্দ, তাই কাহিনীর ক্ষেত্রেও কোন নাটকীয়তা থাকে না। একটি শান্তশিষ্ট গল্পের মধ্যেই আমার যা কিছু শিল্পকর্ম, যদি তা আদৌ থাকে, তা প্রায় অনুচ্চারিত ভাবে নিহিত থাকে। গল্প বলার সময় আমি শুধু গল্প বলারই চেষ্টা করি। তেমন কোন জমজমাট গল্প তার মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও আবিষ্কার করে অবাক হয়েছি

যে, এইসব উপন্যাসের পাঠকও আছেন, এবং সংখ্যায় তাঁরা নিতান্ত কম নন ... আমার গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি স্তর থাকে। সচেতন পাঠকের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তাঁরা বুঝতে পারেন গল্পের বাইরেও কিছু বলার আছে, অন্য স্তরের কোন কথা। [৪]

একথা অনস্বীকার্য যে, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের অন্যতম বিশিষ্টতা এই দ্বিতীয় স্তরের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণেই। উদাহরণ হিসেবে 'লজ্জা', 'বীজ' এবং 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' প্রাপ্ত 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'লজ্জা' উপন্যাসটিতে কাহিনি বলতে যতটুকু আছে, তা আসলে একটি চরিত্রের মানসিক ভারসাম্য হারানোর কাহিনি। কিন্তু, উপন্যাসটির মূল বিষয় হ'ল সার্বিক মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের অপ্রকৃতিস্থতাকে তুলে ধরা। 'বীজ' উপন্যাসে একজন মানুষের আকস্মিক নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কাহিনি থাকলেও, উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে হারানো মূল্যবোধের কাহিনি এবং সেই সূত্রে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিবেক দংশন। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই এক গভীর অর্থবহ জীবন-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য একটি কবিতায় লিখেছেন—

" জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে। " [৫]

'বীজ' যতদিন তোলা থাকে, ততদিন তা সুপ্তপ্রাণ— মাটি, জল, আলো,বাতাসের সংস্পর্শ পেলে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। ক্রমশ মাটির সঙ্গে তার শেকড়-বন্ধন যত দৃঢ় হতে থাকে,ততই সে পাতা মেলে, ডালপালা ছড়িয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে থাকে। 'বীজ' উপন্যাসের শশাঙ্কশেখর আমাদের দেশের সংস্কৃতির বীজ-স্বরূপ। তিনি অনাবিষ্কৃত সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস পুনরুদ্ধার করবার সাধনায় মগ্ন হতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে ছিল বহু স্বপ্ন। কিন্তু, সর্বাতিশায়ী ভোগবাদে আচ্ছন্ন মানুষ তাঁর সাধনার মূল্য দিতে চায়নি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনদৃষ্টি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। শশাঙ্কশেখরের মতো মানুষেরা এই সঙ্কীর্ণ সমাজে থাকতে পারেন না। তাঁদের সাধনার ব্যাপকতা এতটাই গভীর এবং বিস্তৃত যে, তাকে ধারণ করবার জন্য মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি বা বৃত্তে কুলোয় না। তাই শশাঙ্কশেখরবাবুকে এই বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে যেতে হয়। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী 'বীজ' উপন্যাসটিতে মধ্যবিত্ত জীবনের এক নতুন dimension নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসে বাড়ি বদলের কাহিনি থাকলেও বাড়ি বদলের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্রও যে বদলে যায়, সেই বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটি প্রশ্ন এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণেই আমাদের মনে দেখা দিতে পারে। তাহলে কি দ্বিতীয় স্তরের বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই রমাপদর যাবতীয় উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা? — শোনা যাক, এ বিষয়ে স্বয়ং ঔপন্যাসিকেরই মন্তব্য —

কাহিনী বা চরিত্র যেমন আমার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসে হাজির হয়, কোন পূর্ব পরিকল্পনা থেকে নয়, তেমনই এই গল্পের ভূমি ও ভূমিকা ছাড়িয়ে যে অন্য একটি অর্থবহ বিস্তৃত জগৎ উন্মোচিত হয়ে পড়ে কখনও কখনও, তাও আমার কোন সচেতন প্রয়াস থেকে নয়। সম্ভবত। সম্ভবত বলছি এ কারণেই যে, এই ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসগুলি লিখে ফেলি পনেরো কুড়ি দিনের মধ্যেই। এত চিন্তাভাবনা করার সুযোগ কি এত অল্পদিনের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় যে যে-কোন উপন্যাস পনেরো কুড়ি দিনে লেখা হলেও তা আসলে পনেরো কুড়ি বছর ধরেই মনের মধ্যে লেখাজোখা হতে হতে হঠাৎ একদিন গল্প হয়ে বেরিয়ে আসে। তখন খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কোনটা সচেতন চেষ্টা আর কোনটা অবচেতনে জমা হয়ে ছিল। [৬]

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, রমাপদর উপন্যাসের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই লেখকের কষ্টকল্পিত নয়; তা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক পথ ধরেই উপন্যাসে উঠে আসে।

উপন্যাসের আখ্যানভাগ বর্ণনায় ঔপন্যাসিকেরা তিন ধরণের রীতি বা পদ্ধতির যে-কোন একটিকে নির্বাচন করতে পারেন — উত্তম পুরুষ (First Person), মধ্যম পুরুষ (Second Person) এবং প্রথম পুরুষ (Third person)। তবে, মধ্যম পুরুষ বর্ণনরীতি ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। রীতিটি অপ্রাসঙ্গিক এ কারণেই যে, এখানে 'তুমি' সম্বোধন করবেন যিনি, তিনি তো আসলে উত্তম পুরুষই। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস প্রথম পুরুষে রচনা করলেও উত্তম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ—দু'ধরণের রীতি বা পদ্ধতিতেই স্বচ্ছন্দ। সচরাচর দেখা যায়— একজন ঔপন্যাসিক একটি উপন্যাসে একটি পুরুষকেই নির্বাচন করে থাকেন। কিন্তু, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর রচিত এক একটি উপন্যাসের আখ্যানভাগ বর্ণনায় এক একটি পুরুষ নির্বাচন করলেও, এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার ইচ্ছেও তাঁর মধ্যে ছিল। উদাহরণ হিসেবে 'রূপ' উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করা যায়। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে রচিত এই উপন্যাসটিতে তিনি উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ এই দুটি রীতিকেই আশ্রয় করেছেন। উপন্যাসটির একটি পরিচ্ছেদ প্রথম পুরুষে তো পরের পরিচ্ছেদটি উত্তম পুরুষে রচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক যদিও পরবর্তীকালে এ ধরণের আঙ্গিকগত অভিনবত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে চান নি, তবুও দেখা গেছে যে, 'রূপ' উপন্যাসটির পক্ষে এই রীতিটি একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়। 'রূপ' উপন্যাসটির বিষয় যেহেতু মানুষের বানিয়ে তোলা 'ইমেজ' এবং 'ব্যক্তিসত্তা'র মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে রূপদান করা, সেহেতু এক পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যপুরুষকে দেখা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

উপন্যাসের প্রথম পুরুষ বর্ণনরীতির আবার তিনটি প্রকারভেদ রয়েছে — ১. নাটকীয় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রথম পুরুষ বর্ণনরীতি বা dramatic or third person objective — ন্যারেটার এখানে শুধু ঘটনাবলীর তন্ময় বা objective বিবরণ দিয়ে থাকেন, কখনই নিজস্ব মতামত বা ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেন না। ২. সর্বজ্ঞ কথক বা omniscient ন্যারেটারের মাধ্যমে আখ্যানভাগ গড়ে তোলা। ন্যারেটার এখানে সর্বত্র বিরাজ করেন। ঘটনা, চরিত্র, চরিত্রের মনোলোক সবই সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে এবং ৩. আংশিক বা সীমায়িত অর্থাৎ limited omniscient ন্যারেটারের মাধ্যমে কাহিনি পরিবেশন করা। এই রীতিতে লেখক ঘটনার বর্ণনা ও সংলাপ রচনা করেন তন্ময় ভঙ্গিতে এবং কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের ওপর আলোকপাত করা হয়। তার ক্রিয়াকলাপ, ভাবনার সাহায্যে বিষয়বস্তুর বর্ণনা সীমায়িত রাখা হয়। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের প্রথম পুরুষ বর্ণনরীতির স্বরূপটিকে তুলে ধরবার পূর্বে তাঁর লেখক সত্তার পরিচয়টি জেনে নেওয়া ভালো —

> লেখকরা কেমন ধারার মানুষ? ... লেখক তো শুধুই তাৎক্ষণিক ঋষি। পরমুহূর্তেই সে সাধারণ মানুষের মতই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের দাসত্বে বাঁধা, আত্মরক্ষায় রূঢ় এবং কঠোর, অপমান কিংবা অবহেলা সে সমান ওজনে ফিরিয়ে দিতে জানে, জাগতিক বিষয়ে সে কখনো কখনো উদাসীন হতে পারে, প্রবঞ্চিত কদাপি নয়। অনেকের কাছে যা উন্মত্ত প্রার্থনার বস্তু, লেখক তা উদাত্ত উপেক্ষায় দূরে সরিয়ে দিতে পারে। মহৎ ভাবনায় ডুবে থেকে সে কখনো কখনো ছোট ছোট বুদ্ধির ঘরগুলোতে চাবি দিয়ে রাখতে পারে। ... তার বুকের মধ্যে সৃষ্টির উষালগ্নের প্রথম আলোর মত নিষ্কলুষ প্রেমের বিস্ময়বিমুগ্ধ চাপা কান্না থাকতে পারে, তথাপি সে শরীরে হয়তো কখনো নিষ্করুণ নির্মম দস্যুও — পরম আগ্রহে কিংবা চরম উপেক্ষায়। কিন্তু তার অন্তঃসলিলে একটি কিশোর মুখচ্ছবির অবিরাম উদ্ভাস ... সেই কিশোর বালকটিই লেখক। সে কোন প্রস্তুতিতে বিশ্বাস করে না। সে গল্প লেখার জন্যে কোথাও যায় না। সে জীবনকে উপভোগ করে আমি সাহিত্যিক এ-কথা ভুলে গিয়ে। সারা জীবন ধরে বারে বারে সে শহর কিংবা গ্রাম, সমুদ্র কিংবা পাহাড়, মানুষ এবং মানুষ দেখে— সাধারণ মানুষের চোখ

দিয়েই, সাধারণ মানুষের কান দিয়েই সে শোনে। চিন্তা করে। তারপর সে যখন লিখতে বসে তখন সে ঋষির মত পবিত্র মন নিয়ে স্মৃতির মধ্যে ডুব দেয়।" [৭]

কিন্তু, আরেকটি বিষয় এখানে প্রসঙ্গত জানানো প্রয়োজন যে, ঔপন্যাসিক রমাপদ যখন omniscient বা limited omniscient ন্যারেটারের মাধ্যমে উপন্যাস কাহিনি পরিবেশন করেছেন,তখন সেই কথক 'তাৎক্ষণিক ঋষি' অর্থাৎ অদৃশ্য একটি ভিন্ন সত্তা। এই অদৃশ্য সত্তাটির পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন —

সমুদ্রতটে দুজন মানুষ বালির ওপর পাশাপাশি বসে আছে। একজন দৃশ্যমান। তার শরীরী অস্তিত্ব নিয়ে সে শুধু তাকিয়ে দেখছে ঢেউয়ের মাথায় ভেসে ওঠা লোকটিকে। আরে, ও তো ডুবে যাচ্ছে! উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে সে তাকালো তীরের দিকে, লোকটির আপন জনের দিকে। হ্যাঁ, তারও চোখে পড়েছে। কিন্তু সেই আপন জন নির্বিকার কেন? একটা দুর্বোধ্য ক্রূর হাসি কি দেখা গেল তার চোখে? না, এবার সে পাগলের মত ছুটে চলেছে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ... সেই বালির ওপর বসে থাকা দৃশ্যমান মানুষটি উঠে দাঁড়ালো ফিরে চলে গেল আপন গৃহে। ... তার পাশেই কিন্তু বসে ছিল একজন অদৃশ্য মানুষ। সে মনে মনে বললে, জানি, তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু এবার আমার কাজ শুরু ... ঢেউয়ের মাথায় ভেসে ওঠা লোকটি জীবন ফিরে পেয়ে তীরে এসে উঠেছে, তার আপনজনের সঙ্গে চলেছে ... অদৃশ্য মানুষটির কাছে কিছুই অসাধ্য নয়। কোন বাধাই বাধা নয়। সে ঐ দু'জনকে অনুসরণ করে চলে গেল তার অন্দরমহলে। হেঁসেলে, শয্যায়, গৃহকোণে, বারান্দায়— নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অদৃশ্য মানুষটি তাদের দেখল, কথা শুনলো। ... এই অদৃশ্য মানুষটি হলেন ঔপন্যাসিক। [৮]

রমাপদ চৌধুরীর এই 'তাৎক্ষণিক ঋষি', 'অদৃশ্য সত্তা'টি উপন্যাসের মানুষের মধ্যেকার ভেতরের মানুষটিকে বের করে আনে। রমাপদ বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার, ভাষ্যকার। মানুষের মুখ ও মুখোশকে আলাদা করে তাকে একেবারে স্বরূপে হাজির করতে হলে, তাদের একটি 'অদৃশ্য সত্তা'র চোখ দিয়ে দেখাটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। চরিত্রদের পূর্ণরূপে তুলে ধরা এবং বর্ণনা আন্তরিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে এই 'অদৃশ্য সত্তা'টির ভূমিকা অনস্বীকার্য। অতঃপর উপন্যাস রচনায় ঔপন্যাসিকের কর্ম-কর্তব্য সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন —

"রণক্ষেত্রের দামামা বেজে উঠল। লক্ষ লক্ষ সিপাহি,সান্ত্রী,অশ্বারোহী সৈনিক ছুটে এল উন্মত্ত আক্রোশে। বিপরীত দিক থেকেও ঝাঁপিয়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা। ... ঔপন্যাসিক তখন কোনও মিনারের চূড়ায় উঠে নোটবুকে টুকে নেবেন সমস্ত দৃশ্যটা। রাজার অঙ্গে লাল মখমলের পরিচ্ছদ, মাথার মুকুটে মণিমুক্তাহীরের জ্যোতি, সেনাপতির দুঃসাহসিক অভিযান, সৈন্যদের চিৎকার, এসবের একটা কথাও বাদ দেবেন না ঔপন্যাসিক। লিখে নেবেন কতগুলো হাতি, কত ঘোড়া এ যুদ্ধে যোগ দিল। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বর্ণনা ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে নেবেন তিনি। যুদ্ধ জয়ের পর সৈন্যদল দেশে ফিরবে যখন, তখনও পিছনে পিছনে ফিরবেন ঔপন্যাসিক। শঙ্খধ্বনি আর সমারোহের আনন্দ ছিটিয়ে আহ্বান জানাবে প্রবীণা আর নগরকন্যার দল। তাও লিখবেন ঔপন্যাসিক, বর্ণনা দেবেন তাদের, যারা উলুধ্বনির আড়ালে কলরব করে উঠল।" [৯]

কিন্তু, রমাপদর উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা যেমন নেই,তেমনি বাগাড়ম্বরও অনুপস্থিত। 'ইনিয়ে বিনিয়ে' কাহিনিকে ছড়িয়ে দেননি তিনি কোথাও। omniscient বা limited omniscient ন্যারেটার— যার মাধ্যমেই তিনি উপন্যাস কাহিনি পরিবেশন করুন না কেন, যেখানে যতটুকু বলা প্রয়োজন—তার বাইরে একটি কথাও তিনি বলতে চান না।

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণ বা চরিত্রের উপস্থিতি কখনই নাটকীয় হয়ে ওঠে না। কাহিনি বা চরিত্র-দুটোই তাঁর কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরা দেয়। চরিত্রেরা উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে যে কোনো আকস্মিকতার সুযোগই সেখানে থাকে না। ঔপন্যাসিক রমাপদ তাঁর উপন্যাসে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মধ্যবিত্ত মানুষের ছবি এঁকেছেন। এ কারণেই তাঁর উপন্যাসের আরম্ভে কোনো একটি চরিত্র

যে রূপে ধরা দেয়, ক্রমশ সেই চরিত্রটির স্বরূপ বদলে যেতে থাকে। সেদিক থেকে তাঁর উপন্যাসের প্রধান প্রধান পাত্র-পাত্রীরা কেউই 'ফ্ল্যাট' চরিত্র নয়। উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের কিছু বিশিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বাহুল্য। তবে এটুকু বলা যেতেই পারে যে, চলচ্চিত্র বা নাটকে বহির্সজ্জা বা ব্যক্তিত্ব আরোপের সুযোগে একটি চরিত্রকে দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে তোলার সুযোগ ঔপন্যাসিকের নেই। বর্ণনার দক্ষতায় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, তার অবয়ব-লক্ষণ,বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে তার আচরণ ও অভিব্যক্তি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়, যাতে পাঠক সেই চরিত্রটিকে মনশ্চক্ষে দেখতে পান। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের আপাদমস্তক রূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে চরিত্রের অবয়ব-লক্ষণ এবং অন্তরাত্মাকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন — " শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা;তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে,তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম,অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম।" [১০] ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতির মধ্যে বিশিষ্টতা রয়েছে। তিনি চরিত্রের বহিরঙ্গের কিছুটা বিবরণ অবশ্যই দেন; কিন্তু, চরিত্রের অন্তরাত্মা বা প্রকৃত স্বভাবের পরিচয়টি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার ক্রিয়াকলাপ বা অন্যের প্রতি আচরণে। তাছাড়া, প্রথম উপস্থাপনায় চরিত্রটিকে তিনি যে-রূপে তুলে ধরেন—ক্রমশ দেখা যায় সেই চরিত্রটির প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। লক্ষণীয়, 'অভিমন্যু' উপন্যাসের একটি অন্যতম চরিত্র ডঃ অরিজিৎ ব্যানার্জি সম্বন্ধে উপন্যাসের সূচনাতে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন —

> একটা ক্লান্ত অন্যমনস্কতা এসময় অরিজিৎকে আচ্ছন্ন করে থাকে। হাঁটে, বসে, পোশাক বদলায়, কথা বলে, তেমন কৌতুককর কথা শুনে হাসেও, কিন্তু কিছুই মনে থাকে না। পরের দিন স্ত্রী বা মেয়ে প্রসঙ্গ টেনে মনে পড়াতে চাইলে অবাক হয়ে বলে, সে কি, কখন বললে? শুনিনি তো! ... ওরা সকলেই জেনে গেছে অরিজিৎ মানুষটা কেমন আপনভোলা, রীতিমত অন্যমনস্ক। তার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা গর্বও ওদের না থাকার কথা নয়। ... অরিজিৎ ব্যানার্জিকে এখন অনেকেই এক ডাকে চেনে। এই পঞ্চাশ বছর বয়েসেই। [১১]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে, ডঃ অরিজিৎ ব্যানার্জি আপনভোলা, নিপাট ভদ্রলোক। কিন্তু, এই মানুষটি যে আসলে শয়তানের দোসর, স্বার্থপর, তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণ—তার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয়টি উপন্যাসে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। 'আকাশপ্রদীপ' উপন্যাসের অতীশ সোম, 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসের ধ্রুব—এই সমস্ত চরিত্রদের প্রথম দর্শনে একেবারেই চেনা যায় না। ঔপন্যাসিক রমাপদ যেহেতু তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের relativity দেখিয়েছেন, সেহেতু এ ধরণের চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতিটি খুবই কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

রমাপদ চৌধুরীর কোনো উপন্যাসেরই আয়তন দীর্ঘ নয়। কিন্তু, তাঁর উপন্যাসের স্বর (tone) বহুমাত্রিক। প্রকৃতপক্ষে, কোনও একটি কথা বা একটি মন্তব্য যে ভাষায় আমরা শুনি, তার বিন্যাসের ভেতরে যে স্বর-প্রক্ষেপণ থাকে, তা থেকেই ওই কথাটির বা মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝে নিতে হয়। একটি উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের নানা মন্তব্য বা মতামত বিভিন্ন চরিত্র বা ঘটনার প্রতি নানা দৃষ্টিভঙ্গি যে সব পদ্ধতি বা কৌশলের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পাঠকদের কাছে পৌঁছয়, সেগুলির সমাহারেই গড়ে ওঠে উপন্যাসের 'স্বর'। যেহেতু— "মধ্যবিত্তের রঙ্গমঞ্চে প্রায় প্রতিটি মানুষকেই একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। তার কোন চরিত্রটি যে সঠিক বলা খুব মুশকিল" [১২] এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত চরিত্রের মানস প্রবণতার মধ্যে রয়েছে প্রভূত পরিমাণ স্ববিরোধিতা, সেহেতু — মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রের বিচিত্র মানস-প্রবণতাটিকে স্বরূপে তুলে ধরার প্রয়োজনেই রমাপদর উপন্যাসে মাঝে মাঝেই কোনো একটি মন্তব্য বা কথার মধ্যে বহুমাত্রিক স্বর প্রক্ষেপণ ঘটতে দেখা যায়। রমাপদর উপন্যাসে বহুমাত্রিক স্বর-প্রক্ষেপণ কীভাবে ঘটেছে, তা দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাহিরি' উপন্যাসটির কথা। ভারতবর্ষের মতো একটি

উন্নয়নশীল দেশে — যেখানে গরিব ও ধনী মানুষের মধ্যে মানসিকতার ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান এবং যে দেশের জনসমাজের একটা বড় অংশই তথাকথিত ভদ্রলোকেদের কাছে 'বাহিরি' বা বাইরের লোক —তাদের প্রতি কেউ কেউ যে সহানুভূতিপ্রবণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কেউ কেউ যে কিছু একটা করে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে চান — এই 'স্বর'টিকে সামনে রেখে 'বাহিরি' উপন্যাসটির পরিকল্পনা। কিন্তু, উপন্যাসের ভিন্ন 'স্বর'টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন দেখি এই 'কিছু একটা করে যাওয়া'র মধ্যে তথাকথিত ভদ্রলোকেদেরই মানসিকতার ক্ষুদ্রতা প্রকাশিত হয়েছে। 'বাহিরি' শব্দটিই এখানে দ্ব্যর্থক। অন্যদিকে, ১৩৯০ বঙ্গাব্দে লেখা 'ছাদ' উপন্যাসটিতেও উপন্যাসের বহুমাত্রিক 'স্বর' প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, মানুষের তিনটি প্রধান এবং প্রাথমিক চাহিদা— অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান। কাজেই, উপন্যাসটির নামকরণ থেকেই পাঠকের মনে হতে পারে যে, 'ছাদ' আসলে ঘরবাড়ির গল্প। ঔপন্যাসিক অবশ্য পাঠকের এই অনুমান বা প্রত্যাশাকে একেবারে নিরাশ করেন নি। কেননা — এই উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই তাদের মাথার ওপর একটি 'ছাদ' থাকলেই নিজেদের নিশ্চিত মনে করেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে যে পরিবার একটি প্রাচীন অট্টালিকার একাংশের অংশীদার সেই পরিবারটি নিরাপত্তার অভাব বোধ করে উচ্চতল ফ্ল্যাট বাড়ির প্রোমোটারের গ্রাস থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে। কেউ ভাবে আরও বড় এবং সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে সরে যেতে পারলেই সুখ, কেউ ভাবে বেশি ভাড়ার ফ্ল্যাট রক্ষা করাটাই দুরূহ, কেউ ভাবেন এক ছাদের নীচে সকলে মিলে এক সঙ্গে থাকতে পারলেই সুখ, কেউ বা ছাদের নীচে শান্তি খুঁজে পায় না বলেই পালিয়ে বেড়ায়, কারও কাছে একটা স্থায়ী চাকুরি বা চাকুরিতে পদোন্নতিই ছাদ। আধুনিক বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষের এই নিরন্তর আশ্রয় সন্ধান অবশ্যই 'ছাদ' উপন্যাসের একটি 'স্বর'। কিন্তু, উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পাঠের পর আমাদের মনে হয় যে, বস্তুসর্বস্ব মধ্যবিত্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যেও এমন দু'একজন মানুষ রয়েছেন যাঁরা বস্তুজগতের মানুষ হয়েও পার্থিব সম্পদের প্রতি নির্বিকার, নির্লোভ এবং নিরাসক্ত। উপন্যাসের সোমনাথবাবুর মতো নির্লোভ, নিরাসক্ত মানুষেরাই যে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রকৃত ছাদ, শেষ আশ্রয়—এই ভাবটিকেই প্রকারান্তরে উপন্যাসটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এখানেই 'ছাদ' উপন্যাসটির বহুমাত্রিক 'স্বর' পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'খারিজ', 'বীজ', 'চড়াই', 'অভিমন্যু', 'বাড়ি বদলে যায়' — প্রতিটি উপন্যাসেই উপন্যাসের বহুমাত্রিক 'স্বর' অত্যন্ত স্পষ্ট।

উপন্যাসের শিল্পরূপের আলোচনায় লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ বা point of view এর প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাস বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। একই বাস্তব জগৎ থেকেই ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু আহরণ করে থাকেন। কিন্তু, তবুও এই জগৎ বিভিন্ন লেখকের লেখায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। আসলে প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই জগৎ ও জীবনকে নিরীক্ষণ করেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। সচরাচর লেখকেরা বস্তুজগতের ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যাই হোক না কেন— এক একটি উপাদানকে প্রথমে পূর্ণাঙ্গ চিত্র রূপে গড়ে তোলেন নিজের মনের মধ্যে। তারপর নিজস্ব জীবন দর্শনের আদর্শে তাকে প্রকাশযোগ্য ক'রে তোলেন। কিন্তু, এ বিষয়ে ঔপন্যাসিককে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়—লেখকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টি যেন চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত না করে। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী স্বাধীনতা পরবর্তী কালের বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে তাঁর উপন্যাসে এক বিস্তৃত কালের পটভূমিতে সতত পরিবর্তনশীল বাঙালি জীবনের গতি-প্রকৃতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কাজেই উপন্যাস রচনায় সব সময়েই তাঁকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন যে —

> আমি সব সময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছি। কিন্তু আমি তো জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। শুধুমাত্র মৃত্তিকাগন্ধের জীবন নয়, যে জীবন আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত,যে জীবন বাইরের জগতের সঙ্গে এক হাতে, নিজের আত্মবিরোধের সঙ্গে আরেক হাতে অবিরত পাঞ্জা লড়ে চলেছে, আমি তারই ভাষ্যকার হতে চেয়েছি।[১৩]

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, জীবনকে জীবনের মতো দেখার অনুজ্ঞা থেকেই রমাপদ র উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা। তাঁর উপন্যাস ঘটনাপ্রধান নয়, চরিত্রপ্রধান। কাজেই একই চরিত্রকে বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জরুরী হয়ে পড়ে। লেখকের 'অভিমন্যু' উপন্যাসটি বিষয়গত ভাবে নির্বাক অসহায় মধ্যবিত্ত বাঙালি বিবেকের প্রায়শ্চিত্ত। উপন্যাসের ট্রাজিক নায়ক দীপঙ্কর কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে মানব জাতিকে এই রোগের 'অভিশাপ' থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, দীপঙ্করের জানা ছিল না যে, গোটা সমাজটাই আসলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। উপন্যাসে ডঃ দীপঙ্করের সাধনা ও সাধনার ব্যর্থতাকে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। 'বীজ' উপন্যাসে শশাঙ্কশেখর আকস্মিক নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে পরে পরিবারে এবং সমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—তা-ও তিনি দেখিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে। বাংলা উপন্যাসে — " বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনা ও বর্ণনা দিয়ে কল্পনাকে প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন যুক্তি, শরৎচন্দ্রের সবটাই emotion,তারাশঙ্কর রাঢ়ের রুক্ষভূমিতে কল্পনার স্ফুরণ ঘটাতে ভালোবাসেন, বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে মানুষকে স্থাপন করেন। এইভাবেই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর লেখক তাঁদের কল্পনার জগৎকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন।" [১৪] কিন্তু, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল ধরে যূথবদ্ধ মধ্যবিত্ত মানুষের প্রকৃতি, চরিত্র যেভাবে উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন—সেখানে মানুষের স্বার্থপরতা, স্ববিরোধিতা, ভণ্ডামি, বিবেকহীনতার চিত্র তুলে ধরেও শেষ পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্রটিকে সদর্থক মূল্যবোধের জগতে স্থিত করবার বাসনা মনে মনে লালন করে চলেছেন।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর কোনও উপন্যাসই আক্ষরিক অর্থে ঘটনাপ্রধান উপন্যাস নয়। প্লটের সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্য দিয়ে ঘটনার পর ঘটনাকে সাজিয়ে তোলাতে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ একেবারে নেই বললেই চলে। তাঁর উপন্যাসে যা ও বা দু'একটি ঘটনা বা অঘটন ঘটতে দেখা যায় — সেগুলি আমাদের সমাজে প্রতিনিয়তই কোথাও না কোথাও ঘটে চলেছে। 'আরো একজন', 'পরাজিত সম্রাট','জনৈক নায়কের জন্মান্তর' প্রভৃতি উপন্যাসে নায়কের বিবাহ-অতিরিক্ত সম্পর্ক, 'এখনই' ও 'পিকনিক','জৈব' উপন্যাসে একালের ছেলেমেয়েদের সহজ ও স্বাভাবিক খোলামেলা হয়ে ওঠা,'খারিজ' উপন্যাসে একটি বালক ভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যু, 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের একের পর এক বাড়ি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্র ও মানসিকতার বদল, 'আশ্রয়' উপন্যাসে জনৈকা পরিচারিকার অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ—আপাত তুচ্ছ এইসব ঘটনাগুলোর কথা পাঠকদের জানিয়ে দিয়ে ঔপন্যাসিক সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাতেই মনোযোগী হয়ে পড়েন। অধ্যাপক—সমালোচক জগন্নাথ চক্রবর্তী মহাশয় রমাপদর উপন্যাসের এই বিশিষ্ট লক্ষণটির কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন — "A grain of sand is meterial enough for him to build up the world of his fiction, and he seizes a single moment in his grip and squeezes eternity out of it"[১৫] —বস্তুত, রমাপদর উপন্যাস প্রসঙ্গে একেবারে খাঁটি কথাগুলিই বলেছেন সমালোচক। উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে ঔপন্যাসিক ঘটনা নির্মাণের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ বোধ করলেও বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে একের পর এক ঘটনাবিরল উপন্যাস রচনা করেছেন। রমাপদ চৌধুরীর শিল্পকর্মের বিশিষ্টতা এখানেই যে, তিনি আপাত তুচ্ছ বা সামান্য বিষয়কে অবলম্বন করেও জীবনের গভীরে পৌঁছে যেতে পারেন অনায়াসে। 'সাহিত্য অকাদেমি'র Indian Literature- এ তাঁর উপন্যাসের শিল্প-প্রকরণ বিষয়ে লেখা হয়েছে—

> Ramapada Chaudhuri's technique is to choose one spot on the canvas and then throw his piercing spotlight on it. To him there is no objective truth which is not also subjective. He emphasizes the relativity of a situation and the relativity of a character in-a-situation.'Character' is often no better than a temporary response to a given stimulus

which is the objective situation ... the novelist seems to say that we cannot know a man fully as no man becomes a permanent character. 'Character' changes from moment to moment, and existentially speaking, no man is a character until he makes it ... Thus Ramapada Chaudhuri's novels are not novels of action so much as novels of reaction ...[১৬]

বস্তুত, 'সাহিত্য অকাদেমি' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখলে রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের শিল্পরূপের পরিচয়টি আরও স্পষ্টতা পেতে পারে। ঔপন্যাসিক রমাপদ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের ছোট্ট 'ক্যানভাসে' মূলত একটি বিন্দুতেই আপাতত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কিন্তু, এই বিন্দুটিকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে তিনি বিষয়ের গভীরতায় পৌঁছে যান। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসটির কথা তুলে ধরা যেতে পারে। উপন্যাসটির শুরুতেই একটি ভাড়াটে উচ্ছেদের দৃশ্য রয়েছে। মনে হতেই পারে যে, উপন্যাসটি বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের গল্প। কিন্তু, উপন্যাসটিতে ভাড়াটে উচ্ছেদ এবং বাড়ি বদলের কথা থাকলেও এটি নিছক বাড়ি বদলের কাহিনি হয়ে ওঠেনি। বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে সমাজের দুই শ্রেণির মানুষের প্রতীক। বাস্তব জীবনে যাদের ভাগ্যবান (বাড়িওয়ালা) বলে মনে করা হয়,তারা উঠে আসে ওই ভাড়াটে শ্রেণি থেকেই। কেউ আগে উঠে এসেছে,কেউ পরে। কেউ হয়ত উঠে আসতেই পারে না। অথচ এরা সকলেই একই সমাজের মানুষ। এক দল থেকে আরেক দলে উন্নীত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রও বদলে যায়। বাড়ি বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটিই বদলে যায়। রমাপদ চৌধুরী স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিক। তিনি লক্ষ করেছেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন প্রভূত পরিমাণ 'কনট্রাডিকশন্'-এ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যেহেতু 'কনট্রাডিকশন্', সেহেতু— ' He emphasizes the relativity of a situation and the relativity of a character in-a-situation '। 'এখনই' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকের তরুণ-তরুণীদের নতমুখ জড়তা থেকে উচ্ছল স্বাভাবিকতায় পৌঁছে যাবার দিনগুলির একটা রেকর্ড রাখতে চেয়েছেন। ঔপন্যাসিক দেখেছেন নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, স্পষ্টবাদী এবং যেকোনো বিষয়ে দ্রুততার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে তৎপর। তারা প্রবীণ প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি 'স্ট্যাটাস' সচেতন। নোংরা থলে হাতে নিয়ে রোজ সকালে বাজারে যেতে তাদের প্রবল আপত্তি। গুরুভক্তিতে তাদের একেবারেই বিশ্বাস নেই। প্রয়োজনে তারা বাবা-মায়ের সমালোচনা করতেও প্রস্তুত। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে, প্রবীণ প্রজন্মের সঙ্গে একালের নবীন প্রজন্মের এক বিরাট ব্যবধান ঘটে গেছে। কিন্তু, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নবীন প্রজন্মের এই তরুণ-তরুণীরাই যখন প্রখর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তখন সকলকেই এক প্রকার 'অ্যাডজাস্টম্যান্ট' করে নিতে হয়েছে। 'পিকনিক' উপন্যাসে তো রমাপদ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন যে, মানুষের সত্যিকার স্থির চরিত্র বলে কিছু হয় না। আমরা সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায় সচরাচর যে মানুষগুলিকে দেখি তারাই কিন্তু চরিত্র নয়। কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেলেই সমস্ত পৃথিবীটা হয়ে যায় অন্যরকম। এই উপন্যাসের তরুণ-তরুণীদের কাছে 'পিকনিক' মানে একটা বিদ্রোহ। কিন্তু, পিকনিক থেকে যথাসময়ে বাড়ি ফিরতে না পারার সম্ভাবনা দেখা দিলে মুহূর্তের মধ্যেই সেই বিদ্রোহের আগুন নিভে গিয়ে একেবারে জল হয়ে গেছে। 'খারিজ', 'লজ্জা', 'বীজ', 'বাহিরি', 'আশ্রয়', 'স্বার্থ', 'অহঙ্কার'—সর্বত্রই ঘটনা ও চরিত্রের relativity দেখানো হয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজেই তাঁর উপন্যাসের শিল্পরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন —

> সমাজ সংসার নিত্যদিন যখন চলছে, সে স্থির একটি দিঘির মত। সেই দিঘির জলে একটি পাথরের টুকরো ছুঁড়ে দিলেই চতুস্পার্শ্বে ছোট ছোট ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। উপন্যাসের এই ছোট্ট ঘটনাও যেন তেমনই। আশপাশের মানুষদের সেই ঢেউ গিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তশিষ্ট সাধারণ ভদ্র চেহারাগুলি সেই

আঘাতে বদলে যেতে শুরু করে। সকলের মধ্যেই নানারকম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সব মানুষগুলির আসল চেহারা একে একে বেরিয়ে আসে। [১৭]

'বীজ' উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়, ইতিহাসের অধ্যাপক, সমাজের একজন দামি মানুষ শশাঙ্কশেখর কোনও এক বর্ষণক্লান্ত দিনের শেষে স্ত্রীর কাছ থেকে একটি টাকা চেয়ে নিয়ে চিরকালের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। শশাঙ্কশেখরের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া উপন্যাসের একটি 'ঘটনা'—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু, উপন্যাসটিতে এই মানুষটির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর পরিবার ও সমাজের মানুষদের একেক জনের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে — সেই প্রতিক্রিয়াই উপন্যাসটির মূল লক্ষ্যবস্তু। এ কারণেই উপন্যাসটিও শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে হারানো মানুষের গল্প নয়, হারানো মূল্যবোধের গল্প। শশাঙ্কশেখর এবং তাঁর নিরন্তর অনুসন্ধান তাঁর নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত —না পরিবারে, না সমাজে —কোথাও মূল্য পায়নি। কিন্তু নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর সকলেই তাঁকে মূল্য দিতে শুরু করে। 'খারিজ', 'লজ্জা', 'বাহিরি'—প্রভৃতি উপন্যাসেও আমরা দেখি 'action' নয়, বরং 'reaction' দেখাতেই ঔপন্যাসিক অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। 'খারিজ' উপন্যাসে একটি বালকভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যুর পর গোটা মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিক্রিয়া,'লজ্জা'য় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ে মানসিক অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেলে পরিবারের মানুষদের প্রতিক্রিয়া, 'বাহিরি' উপন্যাসে বংশী নুলো ভিখারির হাতুয়া থেকে বি.ডি.অধিকারী হয়ে উঠলে সঞ্জয়দের পরিবারে তার প্রতিক্রিয়া—ঔপন্যাসিক রমাপদ সর্বত্রই— 'action' নয় 'reaction'-এর বাণীরূপ নির্মাণ করেছেন।

একটি তুচ্ছ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জীবনের সমগ্র রূপটিকে তুলে ধরতে হলে জীবন সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। রমাপদর মতো একজন রূপ সচেতন নির্মাতার পক্ষে মালা রচনার জন্যে আলাদা করে ফুলের বাগান করতে হয় নি। হাতের কাছে যে ফুল দেখতে পেয়েছেন, সেগুলোকে তুলে নিয়েই তিনি এক একটি মালা রচনা করেছেন। ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন —

> আমার লেখার অন্দরে একটা মানসিক প্রস্তুতি সারাজীবন ধরেই চলেছে। কোনও একটি গল্প বা উপন্যাসের জন্য পৃথক কোনও প্রস্তুতি থাকে না। চিন্তাভাবনা, বইপড়া, অভিজ্ঞতা, নিজের চোখে দেখা, শোনা, আরও নানান রকমের টুকিটাকি প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে জমা হয়ে তৈরি করেছে অভিজ্ঞতা। নিজের জীবনে সত্যি সত্যি কোনও কিছু ঘটাকেই কেবল অভিজ্ঞতা বলে, তা নয়। [১৮]

লক্ষণীয়, কোনও একটি উপন্যাস বা গল্প রচনার জন্য ঔপন্যাসিক যেহেতু আলাদা করে কোনও প্রস্তুতি নেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না এবং একেবারে রয়ে সয়ে বসে বিরাট পরিকল্পনার গোড়াপত্তন করতে চান না, সেহেতু তাঁর উপন্যাস হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়। রমাপদর উপন্যাসের সূচনা তাই অনেকটা ছোটগল্পের সূচনার মতোই প্রথম বাক্যেই একটা তাৎক্ষণিক কৌতূহল তৈরি করে তোলে। যেমন—

১. 'বনপলাশির পদাবলী' — ' বনপলাশির নতুন দিঘির জলের মতই শান্ত জীবন ছিল বনপলাশি গাঁয়ের। মাঝে মাঝে দু'-একটা মামলা-মোকদ্দমা, কিংবা সামাজিক অঘটন ঘটেছে বটে, কিন্তু এমন চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি কখনও।' [১৯]

২. 'লজ্জা' — ' কলেজ ছুটির পর বাড়ি ফিরেই আমার মনে হল কিছু একটা ঘটে গেছে। অন্যান্য দিন আমি আরো আগে ফিরি। সেদিন চায়ের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে।' [২০]

৩. 'পরাজিত সম্রাট' — ' সমস্ত পাড়াটা মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল। এক বাড়ির জানালা থেকে আরেক বাড়ির জানালায় খবরটা রটে যেতেই উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো সকলের চোখে মুখে।' [২১]

৪. 'ডুবসাঁতার' — ' এ-বাড়িতে আগে কখনও এমন ঘটা করে জন্মদিনের উৎসব হয়নি। তাও কি না একটা মেয়ের জন্মদিন। পুচকে একটা মেয়ের।' [২২]

৫. 'মানুষের সংসার' — ' এমন পরিবেশে এ-রকম একটা ঘটনা কখনও কোথাও ঘটেছে বলে ওদের জানা নেই। কল্পনা তো মানুষকে কত সব উদ্ভট ভাবনায় ভাবিয়ে তোলে, কিন্তু এমন একটা দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে হবে, এ-ধরনের কথা স্বকর্ণে শুনতে হবে, যারা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা কোনও দিন ভাবতেও পারেনি।' [২৩] —

বস্তুত, কোনো রকম আটঘাট না বেঁধে একেবারে সরাসরি গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ার এই বিশেষ রীতিটি রমাপদ আয়ত্ত করেছেন গল্পকার সুবোধ ঘোষের রচনারীতি থেকে। সুবোধ ঘোষ তাঁর 'চিত্তচকোর', 'জয়ন্তী', 'নিশিচক্রবাকী' ইত্যাদি গল্পের আরম্ভেই যেমন একেবারে গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, অতঃপর গল্প বলার মাঝে মাঝে সময় পেলে পরিবেশ-পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন—ছোটগল্প রচনার এই বিশেষ রীতিটিকেই রমাপদ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। কিন্তু, রমাপদর উপন্যাস যেহেতু ঘটনাপ্রধান নয়, সেহেতু উপন্যাসের সূচনাতেই তিনি সেই ঘটনাটির আভাস দিয়ে দেন। ক্রমশ উপন্যাস কাহিনী যত সামনের দিকে এগিয়ে চলে, ততই সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঔপন্যাসিক ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেন মানুষের জীবন সমগ্রতার গভীর প্রদেশে। তাঁর উপন্যাসের সমাপ্তি অংশটুকুও পাঠকের মনে দাগ কেটে দেয়। পরিকল্পিত শান্তরসাত্মক উপসংহারের মধ্যেও এক সুতীব্র ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে দিতে তিনি অত্যন্ত দক্ষ। লক্ষণীয়, করোনার কোর্টে পালানের অকাল মৃত্যুর মামলাটি খারিজ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 'খারিজ' উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে। করোনার ইন্সপেক্টর মামলার রায় ঘোষণা করে জানালেন — " ইট্ ওয়াজ এ কেস অফ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল্ অ্যাকসিডেন্ট। অ্যান্ড হেন্স দি কেস ইজ ক্লোজ্‌ড্।"[২৪] অতঃপর করোনার ইন্সপেক্টর মামলার ফাইল ফিঁতে বেঁধে গিঁট দিয়ে বন্ধ করে দিলেও, পাঠকের ভাবনায় কিন্তু বিচারের এই বাণী উপহাসের মতোই শোনায় এবং মামলাটির চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে যায়। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে এক ধরণের শ্লেষ থাকলেও, উপন্যাসের উপসংহারে শ্লেষের তীব্রতা কম। গল্পকার সুবোধ ঘোষ তাঁর শ্লেষাত্মক ছোটগল্পের উপসংহারে একেবারে চরম কথাটি না বলে কিছুতেই স্বস্তি পেতেন না। 'সুন্দরম' গল্পের উপসংহারে তিনি শুনিয়েছেন — "— শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।" [২৫] 'গোত্রান্তর' গল্পের উপসংহারে শ্লেষের তীব্রতা আরো বেশি — " সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুর্গি চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।"[২৬] রমাপদ চৌধুরী যেখানে উপন্যাস কাহিনীর সমান্তরালে একটি বিপরীতমুখী ভাবনা পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিয়ে পরিকল্পিত শান্তরসাত্মক উপসংহার টেনেছেন, গল্পকার সুবোধ ঘোষ সেখানে অনেকটাই নির্মম। তবে, রমাপদর হাতে পড়ে বাংলা উপন্যাস যে ছোটগল্পের মতোই অনেক স্মার্ট হয়ে উঠেছে — এই বিষয়টি বারবার দেখতে পাওয়া যায়।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের বর্ণনরীতির মধ্যে এক ধরণের নবীনতা রয়েছে। পরম্পরাগত প্রবহমান বর্ণনরীতিকে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন। তিনি চেয়েছেন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ভাষ্যকার হতে— যে জীবন আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন যে সব সময় অঙ্কের নিয়মে চলে এমন নয়। উপন্যাস মানবজীবনের এলোমেলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাহিনিকে সাজিয়ে তুলে একটা পরিচ্ছন্ন নিটোল মূর্তিরূপ দিয়ে থাকে। কাজেই পরম্পরাগত উপন্যাসে ঘটনার পর ঘটনা, একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত আরেকটি ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিক রমাপদ যেহেতু জমজমাট কাহিনি এবং কাহিনির নাটকীয়তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি, সেহেতু তাঁর উপন্যাসের বর্ণনরীতির মধ্যেও এক

ধরণের নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজেই তাঁর উপন্যাসের বর্ণনরীতিটির নামকরণ করেছেন ' Mixed Waves' বা 'মিশ্র তরঙ্গ রীতি'। 'খারিজ' এবং তার পরবর্তী প্রায় সব উপন্যাসেই তিনি এই রীতিটি অনুসরণ করেছেন। রীতিটির বিশিষ্টতা সম্পর্কে রমাপদ নিজেই জানিয়েছেন যে —

> ঘটনার পরম্পরা না রেখে কখনও চলে যাই অতীতে, কখনো পরে যা ঘটার তা আগেই জানিয়ে দিই, কখনো বর্তমানের বিবরণ। কিন্তু তার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা থাকে, ছন্দ থাকে। একেবারে অঙ্কের নিয়মে সমুদ্রের ঢেউ অবিরাম আছড়ে পড়ে তীরের ওপর, তার একটা ছন্দ আছে, পরম্পরা আছে। চিরাচরিত উপন্যাস লেখার রীতি প্রায় সে-রকম, একটা ঢেউয়ের পর আরেকটা ঢেউ আসে সেখানে। কিন্তু একটা হঠাৎ ঝড়ের হাওয়া যখন সেই ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন আপাতদৃষ্টিতে ঢেউগুলো এলোমেলো হয়, নানাদিক থেকে ঢেউ এসে পরস্পরকে আঘাত করে। অথচ মিলিয়ে যাবার সময় তারও একটা নিজস্ব ছন্দ ফুটে ওঠে। আমার এই উপন্যাসগুলিতেও সে-রকম অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমানের ঘটনা বা চিন্তা কোন পরম্পরা রক্ষা না করে এসেছে, কিন্তু সেই বিক্ষিপ্ত এলোমেলো চিন্তা ও ঘটনা ধীরে ধীরে একটা পরিষ্কার ছবি আনে, ছন্দ হয়ে ফুটে ওঠে। তবে সেগুলিকে এমনভাবে মেলানো এবং মেশানো যে, এই রীতিটাকে কখনও পাঠকের চোখে প্রকট হতে দিই নি। কিন্তু এই রীতি উদ্ভাবন বা অনুসরণ অকারণে নয়। যাঁরা উপন্যাস লেখেন তাঁরাই জানেন অনেক সময়ে দুটি পরিচ্ছেদের মাঝখানে একটি পরিচ্ছেদ জুড়ে দিতে হয় সামান্য একটা চার লাইনের ঘটনার কথা জানানোর প্রয়োজনে, অথবা টাইম-গ্যাপ অর্থাৎ কালক্ষেপের প্রয়োজনে। ফলে অপ্রাসঙ্গিক অবান্তর বাড়তি কথায় একটি পরিচ্ছেদ লিখতে হয়। সক্ষম লেখক সেই পরিচ্ছেদটিকেও পাঠযোগ্য করে তোলেন, পাঠক বুঝতে পারেন না সেটি অবান্তর। আমার এই বর্ণনরীতিতে একটি প্রয়োজনীয় বাড়টি কথা লেখার প্রয়োজন হয় না। [২৭]

বস্তুত, উপন্যাসে এই 'মিশ্র তরঙ্গ রীতি'টি ব্যবহারের জন্যেই রমাপদর উপন্যাসে দেখা দিয়েছে আয়তন সংক্ষিপ্তি। 'প্রথম প্রহর', 'বনপলাশির পদাবলী' এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস 'লালবাঈ' ছাড়া প্রতিটি উপন্যাসই আয়তনের দিক থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, একবারের চেষ্টাতেই পাঠযোগ্য। আয়তন সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনার একমুখী গতি থাকায় কেউ কেউ এই উপন্যাসগুলিকে অনেকটা বড়গল্পের সমীপবর্তী বলে থাকেন। কিন্তু, এগুলো উপন্যাসই। জীবনদর্শনের গভীরতাই এই ক্ষুদ্রকায় রচনাগুলিকে উপন্যাস শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজেও এই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> উপন্যাসের মূল প্রকৃতিও এখানেই। দর্জির ফিতে দিয়ে দৈর্ঘ্য মেপে তার পরিচয় পাওয়া যায় না, চরিত্রের সংখ্যা গুণে তার হদিশ মেলে না, পটভূমির পরিধি দেখে তাকে চিহ্নিত করা যায় না। যিনি রাজ্য ছেড়ে আসেন, যাঁর সঙ্গে নেই কোন সৈন্যসামন্ত, যাঁর অঙ্গে নেই রাজপোশাক, মানুষের মনের জগতে তিনিই তো হয়ে আছেন রাজার মত রাজা। সিংহাসন বা রাজ্যের বিস্তৃতি তাঁর পরিচয় নয়। [২৮]

একটি নাটক বা একটি গল্পের মতো একটি উপন্যাসেও যেসব ঘটনা থাকে, যেসব চরিত্র তাদের চলনে-বলনে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পাঠকের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে, সেইসব ঘটনা ও চরিত্রের একটি স্থানকাল নির্দেশিত ক্ষেত্রভূমি থাকবেই— " নাটকে যেমন মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে বাস্তব জগতের একটি অধ্যাস (illusion) তৈরি করেন নাট্যকার ও পরিচালক, চলচ্চিত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'location', উপন্যাসে তেমনি কল্পনাশক্তি ও বর্ণনাশৈলীর দক্ষতায় লেখক নির্মাণ করেন পটভূমি ও প্রতিবেশ। ঘটনা ও চরিত্রের শেকড় থাকে পটভূমি তথা প্রতিবেশের মাটিতে।" [২৯]— এ কারণেই উপন্যাস-শিল্পের আলোচনায় পটভূমি তথা প্রতিবেশের প্রসঙ্গটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেক শুরু করে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করেছেন, তন্মধ্যে 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসটিতে তিনি স্মৃতিসূত্রে ফিরে গিয়েছেন তাঁর জন্মভূমি রেলশহর খড়্গপুরের ঐতিহাসিক পটভূমিতে। রেলশহর খড়্গপুরের গড়ে ওঠার বিবরণ রয়েছে উপন্যাসটিতে। তবে, উপন্যাসের প্রথমে ও শেষে শহর কলকাতার পটভূমি। 'লালবাঈ' উপন্যাসটির পটভূমি

ঐতিহাসিক। 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ্' উপন্যাসে পূর্ণত এবং 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ও 'শেষের সীমানা' উপন্যাসে অংশত আঞ্চলিক পটভূমি রয়েছে। 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' ও 'রূপ' উপন্যাসদ্বয় রচিত হয়েছে ওড়িশার ভুবনেশ্বর ও পুরীর সমুদ্রের পটভূমিকায়। রমাপদর এই সমস্ত উপন্যাসে প্রাকৃতিক নিসর্গদৃশ্যের সংস্থাপনে যে পটভূমি নির্মাণ বা নির্বাচন করা হয়েছে— তা নানা দিক থেকে মানবমনের আবেগানুভূতির দ্যোতক বা প্রতীক হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, কালের নিয়মেই বাঙালি মধ্যবিত্তের বাসগৃহ ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নগর কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি পর্যাপ্ত নয়। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে অধিকাংশ বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষ বসবাস করেন হয় ভাড়াবাড়িতে, নয় বিভিন্ন মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের ছোট্ট খোপে। মধ্যবিত্ত মানুষ এখানে স্বস্তি পান না। কাজেই সময়-সুযোগ পেলেই তারা চলে যান বন, পাহাড় কিংবা সমুদ্রের মুক্ত পটভূমিতে। সংসারের চার দেয়ালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষ সেখানে স্বরূপে ধরা দেন। প্রকৃতির মুক্ত ও অবাধ পটভূমিতে মধ্যবিত্ত মানুষের সঙ্কীর্ণ জীবনদৃষ্টির উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উপন্যাস কাহিনি স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে যায় প্রতীকের পরমার্থতা। উল্লিখিত এই উপন্যাসগুলি ছাড়া অন্য সমস্ত উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন শহর কলকাতার পটভূমি, শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত জগৎ ও জীবনের পটভূমি। স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এক বিস্তৃত সময় পর্বে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বহু উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া,বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি—সেইসূত্রে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনদৃষ্টির পরিবর্তনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শহর কলকাতার নাগরিক জীবনের পটভূমিতে। উপন্যাসের শিল্পরূপের আলোচনায় 'পটভূমি'র পরেই আলোচ্য বিষয় উপন্যাসের 'প্রতিবেশ'। প্রকৃতপক্ষে 'পটভূমি' ও 'প্রতিবেশ' পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়, পটভূমিকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে 'প্রতিবেশ'। তবুও সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পটভূমির সঙ্গে প্রতিবেশের পার্থক্যটি বোঝা যায়। উপন্যাসের পটভূমি নানারকম হতে পারে—ইতিহাসগত পটভূমি, আঞ্চলিক পটভূমি, মানসিক পটভূমি, সাংকেতিক পটভূমি ইত্যাদি। অন্যদিকে, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের চলাফেরা, কথাবার্তা, জীবনধারা ইত্যাদির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক আভাসিত করেন এমন একটি সার্বিক পরিমণ্ডল—যা উপন্যাসের 'প্রতিবেশ' হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, 'প্রতিবেশ' (milieu) আসলে উপন্যাসের সামগ্রিক বাতাবরণ। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার, ভাষ্যকার। তিনি তাঁর উপন্যাসে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মানুষের জীবনের প্রকৃত ছবিটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে একশ্রেণির মানুষের মানিয়ে নিতে না পারার সংকট অনায়াস রূপ পেয়ে যায় তাঁর উপন্যাসে। উপন্যাসের চরিত্রদের তিনি যেমন আদর্শায়িত করে তুলবার প্রয়াস করেননি,তেমনি বিকৃত করেও দেখাননি কোথাও। তাঁর উপন্যাস পাঠকালে আমাদের মনে হয় মধ্যবিত্ত মানুষগুলিকে তিনি যেন একেবারে স্বরূপে তুলে এনে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। ঔপন্যাসিক রমাপদ দাবী করেছেন যে,সুদীর্ঘ কালের প্রেক্ষাপটে তাঁকে সবসময় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়েছে। তিনি তাঁর এক একটি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন সমসাময়িক কালেরই এক একটি দিকচিহ্ন। তাঁর রচিত সমস্ত উপন্যাস এক সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এক বিস্তৃত সময়ের প্রেক্ষাপটে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সার্বিক বাতাবরণের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের 'প্রতিবেশ' এমন একটি সামগ্রিক বাতাবরণ— যা সমসময় ও সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত।

'উপন্যাস' শিল্পের মূল আশ্রয় তার 'ভাষা'। উপন্যাসের বিষয় ও ভাবনাকে যথাযথভাবে বহন করে তার ভাষা—যা লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্রও রচনা করে। ঔপন্যাসিক তাঁর ভাষাকে ব্যবহার করেন শব্দ, বাক্য,

চিত্রকল্প, প্রতীক, উপমা, রূপকাদি অলঙ্কার ইত্যাদির সচেতন ও সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে। একজন লেখকের ভাষা ব্যবহারের বিশিষ্টতাই তাঁর উপন্যাসের 'শৈলী' বা 'style'। এদিক থেকে উপন্যাসের ভাষা শুধুমাত্র প্রকাশ-মাধ্যম নয়, তা লেখকের সৃজনী ব্যক্তিত্বেরও পরিচায়ক। উপন্যাস জীবনের সামগ্রিক রূপের দর্পণ। মানবজীবনের বহু বিচিত্র ও বহুকৌণিক বাস্তবতাকে আশ্রয় করে রচিত হয় এক-একটি উপন্যাস। সঙ্গত কারণেই কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষারীতিকে উপন্যাসের এক এবং অদ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। যেহেতু ভাব প্রকাশের জন্যে প্রথমে প্রয়োজন শব্দের, এ কারণেই শব্দপ্রয়োগ বা diction শৈলীবিচারের প্রাথমিক বিষয়। সাহিত্যতাত্ত্বিক-সমালোচকদের মতে, 'ডিকশন্' হতে পারে তিন প্রকার— 'আনুষ্ঠানিক' (formal/high), 'নিরপেক্ষ' (neutral/middle) এবং 'আটপৌরে'(informal/low)। [৩০] 'আনুষ্ঠানিক' শব্দপ্রয়োগ পদ্ধতিতে সুবিদিত, সম্ভ্রান্ত ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও গম্ভীর শব্দ নির্বাচন করা হয়। 'নিরপেক্ষ' পদ্ধতিতে সাধারণ বা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় সহজ ও সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসে। আর– কথ্য বা মুখের কথার রীতিতে শব্দ যখন 'স্ল্যাং'-এর সীমারেখা ছুঁয়ে যায়, তখন তাঁকে বলা হয় 'আটপৌরে' শৈলী। এই তিনপ্রকার শৈলীর মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, — " বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষায় সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে।" [৩১] একালের সমালোচকের কণ্ঠেও বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় — " ঔপন্যাসিকের ভাষাকে একটি ব্যাপারে সমর্থ হতে হবে। সে সামর্থ্য হলো, জীবনের কঠোর বাস্তবতা ও জীবনের গভীর কাব্য—দুটিকেই একই ভাষাবৃন্তে ধরে রাখার সামর্থ্য। জীবনের কাব্য জীবনের বাস্তবতারই প্রতিক্রিয়াজাত গভীর চেতনার অনুভূতি। তাই বাস্তবতার উন্মোচন-সূত্রেই জীবনের কাব্যকে আয়ত্তে আনতে হয়।" [৩২]

কথা-সাহিত্যের জগতে রমাপদ চৌধুরী আগে ছোটগল্পকার,পরে ঔপন্যাসিক। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছোটগল্প রচনা শুরু করলেও প্রথম উপন্যাস লিখেছেন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাস রচনার পূর্বে প্রায় দেড়-দশক কাল ধরে তিনি যে সমস্ত ছোটগল্প রচনা করেছেন—সেগুলির মধ্যে ভাষা নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে—

> একসময়ে আমি ঝকমকে ভাষায় অভ্যস্ত ছিলাম, আঙ্গিকের নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তেজনা বোধ করতাম। শব্দের পর শব্দকে কত সুন্দরভাবে সাজানো যায় কিংবা কোন বাক্য কোথায় অমোঘ হয়ে ওঠে। তখন নতুন নতুন শব্দচয়ন আমার এক নতুন নেশা। পুরনো শব্দকে নতুন অর্থে প্রয়োগ করি। গ্রাম্য শব্দকে সংস্কার করে তুলে আনি। কখনো নিজের খেয়ালে শব্দ বানাই। প্রবীণ লেখক কিংবা কোনো বিখ্যাত কবি, কিংবা সংবাদপত্র সে-সব শব্দ পুনঃপ্রয়োগে আমাকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু এরপর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম,কোন নতুন শব্দই কেউ নতুন থাকতে দেয় না। ব্যবহারে ব্যবহারে তাকে জীর্ণ করে দেয়। আর এই ভাষার বিলাস আমাকে হৃদয়ের কাছে পৌঁছতে দেয় না। বলার কথাকে অস্পষ্ট করে তোলে। তাই সরল হতে চাইলাম, সহজ হতে চাইলাম। অলঙ্কার আভরণের বাকল ফেলে দিয়ে বাহুল্য বর্জন করে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইলাম। 'দরবারী'তে যাকে পাবার প্রথম চেষ্টা, 'আমি,আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পে তার সাক্ষাৎ পেলাম। [৩৩]

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প রচনার প্রথম পর্বের একটি বিখ্যাত ছোটগল্প 'সহযোগ'(১৩৫২বঙ্গাব্দ)। লক্ষণীয়, এই গল্পের ভাষা অত্যন্ত ঝকমকে —

> রেলের কলোনী। পাহাড় ফাটিয়ে টানেল কেটে এগিয়ে গেছে রেলের লাইন। জঙ্গল সাফ করেছে, জাঙ্গাল বেঁধেছে। রূপনারায়ণ আর মহানদী, কংসাবতী আর মধুমাটির মতো হাজারো ছোটবড় নদী। তন্বী শ্যামার শীর্ণ

দেহ কোনওটির, আর কোনওটি বা স্তনিত তরঙ্গিণী। ...অর্থ পিপাসু প্রয়োজনের মন কিন্তু রসাহরণ করতে ছাড়েনি। বিশালদর্শন লোহার থাম, বড় বড় টি আর জয়েন্ট, অ্যাঙ্গেল আর স্টিলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে নাগরাশ্লেষী নদীর বুক। ইস্পাতের আঁট-কাঁচুলির চাপে থেমে থিতিয়ে গেছে অধীর স্পন্দন। নাগরী নদী অ্যানিকাটের জানালা দিয়ে লুকিয়ে সাগর দেখে। ... বিস্তৃত বাগিচায় পাতা আছে সবুজ ঘাসের জাজিম। কাঁটাবেড়ার পাশে পাশে সাদা ধবধবে অটল অনড় ইউক্লিপটাসের গুঁড়ি। ক্রিসেন্থিমাম আর কাঠগোলাপ। মৌসুমী ফোটে মৌসুম বুঝে। ... জনসনের জনশূন্য হারেম দেখা যায় সেখান থেকে।[৩৪]

'সহযোগ' গল্পটি রচনার সময় রমাপদ এম.এ ক্লাসের ছাত্র। এই সময়ে তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকার সংস্পর্শে এসেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রশংসা পেয়ে অনুপ্রাণিত রমাপদ তখন তাঁর ছোটগল্পের জন্য নিজস্ব এক ঝকমকে ভাষাশৈলী নির্মাণ করে নিয়েছেন। কিন্তু, শীঘ্রই তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, মধ্যবিত্ত জীবনের ভাষ্যকার হতে গেলে, মানুষের প্রাত্যহিক দিনযাপনের মুখোমুখি দাঁড়াতে গেলে তাঁকে সরল হতে হবে, সহজ হতে হবে। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পে তিনি একেবারে কথ্যভাষার ভঙ্গিটিকেই অনুসরণ করেছেন—

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠাল। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি। ওই লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরি।' বড় জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হল, আমি বয়সের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম,সেদিন থেকেই বড় জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিল। আর যেহেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হল 'নতুন'। তা বড় জা বললে, 'দেখ্ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এর পর তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হবে। ... ছোট্ ঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কি দার্জিলিঙ কোথাও বেড়িয়ে এসো দিন কয়েকের জন্যে। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি।'[৩৫]

'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পটি রচনার পূর্বেই রমাপদর লেখা পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসটির ভাষা অনেকটাই সহজ, সরল, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে এই উপন্যাসটিতে তিনি ঝকমকে, অলঙ্কারবহুল,কাব্যিক ভাষা ব্যবহারের ঝোঁক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর ঘটনা বর্ণনার ভাষাতেও কাব্যময়তা রয়েছে—

অমাবস্যার শ্মশান। চন্দন কাঠে সাজানো চিতা। আর সামনেই এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। হরিবোল ধ্বনিতে শ্মশানবন্ধুরা বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে থেকে থেকে। ... আর এদিকে বৃদ্ধের মৃতদেহের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অপরূপ সুন্দরী এক ব্রাহ্মণ বধূ। রূপলাবণ্যময়ী এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে স্থির অবিচলিত চোখ মেলে। রক্তবস্ত্র পরিহিতা সেই নীরব রূপ যেন লেলিহান অগ্নিশিখার মতো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সর্বশরীর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা সেই ঘৃতস্নাত হরিদ্রাচর্চিত যৌবনদেহ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবে। সঙ্কল্পের প্রতীক হিসেবে তাই তার দক্ষিণ করে একটি আম্রশাখা। হরিবোল ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ স্বামীর শবদেহ চিতায় তুলে দেওয়া হল। সদ্য বৈধব্যের শোক নয়,বধূর মুখে তৃপ্তির হাসি।[৩৬]

—লক্ষণীয়, এই ভাষার একটা আকর্ষণী শক্তি থাকলেও তাতে সতীদাহের বীভৎসতা খুব একটা ফুটে ওঠেনি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের ভাষাকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু, বিষয়ের গভীরতা অনুসারেই যে ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হয়—এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' বিশুদ্ধ রোমান্স—ভাষা কাব্যময়, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য এখানে। কিন্তু, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যেখানে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে তৎসম শব্দ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল,তার পরে কে ভিক্ষা দেয়।—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ...মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই,সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল।[৩৭]

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসে যে ধরণের ভাষা ব্যবহার করেছেন—স্বল্পকালের মধ্যেই সেই ভাষারীতির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। অতঃপর—

ঐতিহাসিক উপন্যাসটির (লালবাঈ) মধ্যে সব রঙ বিসর্জন দিয়ে নিরাভরণ হবার চেষ্টা করলাম ভুবনেশ্বরের ছোট্ট হোটেলটির বহুবিচিত্র চরিত্র নিয়ে লেখা 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' উপন্যাসে। বনপলাশি পার হয়ে 'এখনই', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' থেকে 'খারিজ'—সেই একই যাত্রা। কিন্তু সব সহজ ভাষাই একই রকম সহজ নয়। তার মধ্যেও বহুবৈচিত্র্য। আসলে ভাষা বা বর্ণনাভঙ্গি তো বাহন। আমার গন্তব্য যদি হয় তীর্থদর্শন,আমি একটু একটু করে দু'পাশের নিসর্গদৃশ্যের স্বাদ নিতে নিতে দু'পাশের মানুষকে দেখতে দেখতে যাবো, তীর্থে পৌঁছলেই আমি সার্থক। গন্তব্যে পৌঁছনোটা যদি বিপজ্জনক রকমের জরুরী হয়, তখন অনেক কিছুই বাহুল্য। আমি কারো দিকে ফুলের মালাটা যে-ভাবে ছুঁড়ে দেব, হাতের ঘুঁষিটা সে-ভাবে নয়। সেজন্যেই আমি সবসময় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছি।[৩৮]

'লালবাঈ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। অলঙ্কারশাস্ত্র স্বীকৃত বিভিন্ন রসের পাশাপাশি সার্থকভাবে ঐতিহাসিক রস সৃজনের প্রতিই এখানে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ। তবুও এই উপন্যাসটির ভাষায় যুক্ত হয়েছে স্বাভাবিক সরলতা—'' পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে আজও নাকি এক অবোধ্য চাপা দীর্ঘশ্বাস গুমরে মরে। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখলে হঠাৎ মনে হয়, যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।" [৩৯] 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত রমাপদ যে সব উপন্যাস লিখেছেন—সর্বত্রই ভাষারূপের মধ্যে এক ধরণের সারল্য বর্তমান। 'সব ভাষাই একই রকম সহজ নয়। তার মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য।' সাদামাটা, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সহজ ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েও যে ব্যঞ্জনাগর্ভ বিষয় ফুটিয়ে তোলা যায়,তার দৃষ্টান্ত তো রমাপদ চৌধুরী রচিত প্রায় প্রতিটি উপন্যাস। উপন্যাস শিল্পের উপকরণ হিসেবে সংলাপের ব্যবহারও স্বীকৃত। শুধু ন্যারেশান বা বর্ণনায় অনেক সময় চরিত্রের অন্তর্জীবনের নাগাল পাওয়া যায় না। সংলাপের মধ্যে দিয়েই পাত্র-পাত্রীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার ততটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, সংলাপের যথাযথ ব্যবহার কাহিনি ও চরিত্রের অন্তর্জগৎ উন্মোচনে বিশেষ সহায়ক। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনায় রমাপদর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের নারী-পুরুষের মুখের ভাষা অকৃত্রিমভাবেই উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষাও কৃত্রিমতাবর্জিত। তাঁর 'বনপলাশির পদাবলী' একমাত্র গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটির জন্যে বিশেষ ধরণের ভাষারীতি ব্যবহার করতে হয়েছে—

একটি বিষয়ে লিখতে শুরু করার আগেই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলাম,সংলাপের ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করব না। আমাদের বড় বড় ঔপন্যাসিকেরাও দেখেছি, গ্রামের সম্পন্ন মানুষদের মুখে শহরচলতি মার্জিত ভাষার সংলাপ বসিয়ে দেন, এবং নিম্নশ্রেণীর মুখে দেন জেলা ভিত্তিক উপভাষা। আমার অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। গ্রামের মানুষ উচ্চবিত্তই হোক বা উচ্চবর্ণই হোক,গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে। আমি সেই ভাষাই দিয়েছি তাদের মুখে। লক্ষ করেছি, আমাদের বাংলা সাহিত্যের বড় বড় ঔপন্যাসিকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসেও এক ধরণের বর্ণাশ্রম প্রয়োগ করে এসেছেন। যেটুকু অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাতে দেখেছি, গ্রামের ভদ্রশ্রেণীর লোক, এমনকি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং যজমানি যাদের পেশা তেমন গ্রাম্য গুরু-পুরুহিতাদিও আঞ্চলিক গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেন, এমনকি

স্বয়ং তারাশঙ্করের মুখের ভাষাতেও যে রাঢ়ীয় শব্দ ব্যবহৃত হত এবং তা 'রেঢ়ো' টানে উচ্চারিত হত সে-কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু ঔপন্যাসিকরা ভদ্রশ্রেণীর মুখে যে-সব সংলাপ বসিয়ে এসেছেন তা অনেকটা ধোপদুরস্ত চলিত ভাষা। আমি উপন্যাসের সংলাপে সে-ধরণের মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে চাইনি।[৪০]

এ কারণেই দেখা যায়, এই উপন্যাসে গিরিজাপ্রসাদ, তাঁর স্ত্রী নিভাননী ও দুই মেয়ে কমলা ও বিমলা দীর্ঘদিন শহরে বসবাসের সূত্রে শহরচলতি ভাষায় কথা বললেও আজন্ম গ্রামবাসী মানুষদের মুখের ভাষা গ্রাম্য—তা তিনি সম্পন্ন কৃষক বা দরিদ্র মানুষ যেই হোন না কেন। অন্যদিকে 'এখনই' বা 'পিকনিক' উপন্যাসের সংলাপে রমাপদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাস দুটিতে ঔপন্যাসিক বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকের নবীন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের খোলামেলা হয়ে ওঠার স্বাভাবিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সুতরাং এই উপন্যাসটিতে নবীন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের চরিত্রোপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে টিকলুর মুখের ভাষা তার চরিত্রেরই উপযোগী— " আরে বাবা, লাইফটাকে একটা হায়ার-পার্চেজ করে নে। এখন ভোগ কর, পরে দাম দিবি। তা না, এখন চিনে বাদাম খেয়ে পেট ভরাও, শালা ফল্‌স টিথ দিয়ে মাংস চিবোনোর আশায়।" [৪১] 'পিকনিক' উপন্যাসের ইতু-র কথা-বার্তা,আচার-আচরণে কোনো জড়তা নেই। কারো সঙ্গে কেউ তার পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলে সে নিজেই বলে— " আমি ইতু সান্যাল, পাঁচ ফুট পাঁচ, অনার্স ছিল হিস্ট্রিতে . . . ।" [৪২] রমাপদর বিভিন্ন উপন্যাসে 'শালা', 'শুয়োরের বাচ্চা' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখে শালীনতার প্রশ্নে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, এই শব্দগুলিই চরিত্রের স্বরূপটিকে চিনিয়ে দেয়। রমাপদর উপন্যাসে অনেক আটপৌরে (informal) শব্দের ব্যবহার থাকলেও তা কিছুতেই শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেনি। অতিক্রমনের সম্ভাবনা যেখানে দেখা দিয়েছে, সেখানেও তিনি আশ্চর্য সংযম দেখিয়েছেন। 'চড়াই' উপন্যাসের শিক্ষিত পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর ইতর কলহকে তিনি যেমন সকলের সামনে আনেননি, তেমনি 'আকাশপ্রদীপ' উপন্যাসের বস্তিবাসীদের কলহ এবং তাদের মুখের 'স্ল্যাং' শব্দাবলীও প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন নি। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের 'ডিকশন্' 'আনুষ্ঠানিক' বা formal ও নয়—তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহজ গদ্য। সংলাপ চরিত্রানুযায়ী। তাঁর ভাষা জীবনের কঠোর বাস্তবতা এবং জীবনের গভীর কাব্য—দুটি বিষয়কেই একবৃন্তে ধরে রাখতে সমর্থ। উদাহরণ হিসেবে 'শেষের সীমানা' উপন্যাসের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে— " মানুষ যতদিন অসহায় থাকবে, সে তাকিয়ে থাকবে, অপেক্ষা করবে। বিশ্বাস করবে মির‍্যাক্‌ল আছে। ... উঠে দাঁড়িয়ে সকলেই তাই শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে টুংরিবাবাকে। তাকিয়ে আছে। আমিও সেদিকে তাকালাম। বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল। দুর্বোধ্য একটা ব্যথা। আমি চোখ বুজে মনে মনে বললাম, টুংরিবাবা, একবার, একবার অন্তত তুমি সত্যি সত্যি মির‍্যাক্‌ল হয়ে ওঠো,মির‍্যাক্‌ল ঘটিয়ে দাও।"[৪৩]

কবিতার তুলনায় উপন্যাসে চিত্রকল্প, উপমা, প্রতীকের ভূমিকা কম— " কবিতায় বলার কায়দাটা আলাদা ... তার স্বভাবধর্ম আটপৌরে জীবনের স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতার দিকে নয়, বরং অন্তর্গূঢ়তার দিকে, যেখানে আছে আলোছায়ার খেলা, আছে আভাস, আছে চকিত দ্যুতি।" [৪৪] 'উপন্যাস' জীবনের ছবিটিকে স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত করে তোলে। তবুও, কবিতায় ব্যবহার্য এই উপাদানগুলি উপন্যাসে একেবারে পরিহার্য নয়। কেননা— " কবিতার চিত্রকল্প অনুভূতিকে গাঢ় করে, উপন্যাসের চিত্রকল্প অনুভূতিকে বিশ্লেষণের (কাহিনী বিকাশের পথে) সুযোগ করে দেয়।" [৪৫] ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর উপন্যাসে অলঙ্কার-আভরণের বল্কল পরিত্যাগ করে, সমস্ত প্রকার বাহুল্য বর্জন করে সহজ-সরলভাবে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইলেও, একজন রূপসচেতন নির্মাতা হিসেবে উপন্যাস-শিল্পের মূল কাঠামো নির্মাণে এসব উপাদানের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নি। দেখা যায়— তিনি তাঁর উপন্যাসের সহজ সরল বর্ণনরীতির মধ্যেও চিত্রকল্প, উপমা, প্রতীকের সার্থক মিশ্রণ

ঘটিয়েছেন। 'স্বার্থ' উপন্যাসের শেষাংশে প্রকৃতি-রূপের চিত্রকল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিণতি সার্থকভাবে ব্যঞ্জিত করেছে। উপন্যাসটির মূল বিষয় একজন অকাল বিধবা রমণীর বৈধব্যের সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে 'আমি' হয়ে ওঠা। উপন্যাসের নায়িকা জয়া উপন্যাসের শেষে পারিবারিক, সামাজিক রক্ষণশীলতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে যখন নিজেকে নতুন করে চিনতে পেরেছে, তখন — " সমস্ত পৃথিবী কেমন বদলে গেল ... সারা রাস্তা জুড়ে যেন শুধুই কৃষ্ণচূড়া, মাথাভর্তি কৃষ্ণচূড়া নিয়ে গাছগুলো সব আড়াল করে দিয়েছে। সাদা থান কাপড়ের স্মৃতি এখন রঙে রঙে রঙিন।" [৪৬] ঔপন্যাসিক রমাপদ যেহেতু বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ভাষ্যকার, সেহেতু তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমাগুলি একেবারেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে আহৃত। 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসে ধ্রুবর ঘরে জানালা থাকা সত্ত্বেও হাওয়া একেবারেই ভেতরে ঢোকে না। ঔপন্যাসিক লিখেছেন — " চোর এবং হাওয়া একই প্রকৃতির, পালানোর পথ না থাকলে ঢোকে না।" [৪৭] রূপক-প্রতীকের ব্যবহারেও ঔপন্যাসিক রমাপদ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। 'চড়াই' উপন্যাসে উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বার্থান্বেষী মানুষের ক্রমিক উত্থান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মীদের মধ্যে বিভেদ-রেখার চিহ্নটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে 'কমোডে'র রঙ্-বিন্যাসের প্রতীকে। 'সাদা দেয়াল' উপন্যাসে সাদা দেয়াল হয়ে উঠেছে প্রবীণ প্রজন্মের নিঃসঙ্গতার প্রতীক। 'অভিমন্যু' উপন্যাসের দীপঙ্কর এ যুগের অভিমন্যু। 'পিকনিক' পারিবারিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে নবীন প্রজন্মের বিদ্রোহ। 'শেষের সীমানা' মানুষের সার্বিক অসহায়তার প্রতীক। সব মিলিয়ে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের শিল্পরূপটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, সার্থকতার উন্মুখ অভিসারী।

নির্দেশিকা ঃ

১. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' - (তৃতীয় খন্ড) ঃ সুকুমার সেন। প্রথম আনন্দ সংস্করণ। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কার্তিক,১৪০৩ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা —৯, পৃষ্ঠা — ১৫৭।

২. 'উপন্যাসের সময়'—তপোধীর ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। জানুয়ারী ২০০৯। এবং মুশায়েরা। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১২।

৩. 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা'— সত্যেন্দ্রনাথ রায়। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা— ৭৩। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০০। পৃষ্ঠা— ১৪।

৪. 'বাড়ি বদলে যায়', প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (৬) — রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা— ৯। পৃষ্ঠা- ৪৯৯।

৫. 'আগামী'—সুকান্ত ভট্টাচার্য। সুকান্ত-সমগ্র । পুনমুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১২ বঙ্গাব্দ। সারস্বত লাইব্রেরী। কল—৬। পৃষ্ঠা—২০।

৬. 'বাড়ি বদলে যায়', প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (৬)—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সং ১৯৯৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কল—৯। পৃষ্ঠা— ৪৯৯।

৭. 'ঋষি, দস্যু, এক কিশোর বালক'—রমাপদ চৌধুরী। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা— ১৭০।

৮. 'ভূমিকা', উপন্যাস সমগ্র (১)— রমাপদ চৌধুরী। চতুর্থ মুদ্রণ—জানুয়ারী ১৯৯২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা — ৩।

৯. 'ভূমিকা',গল্পসমগ্র—রমাপদ চৌধুরী। দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কল—৯।

১০. 'চতুরঙ্গ', উপন্যাস সমগ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুনমুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৫। রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—৩।

১১. 'অভিমন্যু', উপন্যাস সমগ্র (৩)—রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। পৃষ্ঠা—১৪৩।

১২. 'সেই বাঙালি বাবুটি'— 'গদ্য সংগ্রহ'। রমাপদ চৌধুরী। এবং মুশায়েরা—কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী ২০১১। পৃষ্ঠা—১৯।

১৩. 'ঋষি,দস্যু, এক কিশোর বালক',গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১১। এবং মুশায়েরা। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—৫১-৫২।

১৪. উপন্যাসে আঙ্গিক ঃ বিভূতিভুষণ ও তারাশঙ্কর—চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯০। রত্নাবলী। কল—৯। পৃষ্ঠা—৮।

১৫. সাহিত্য অকাদেমির Indian Literaure -এ প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ। উদ্ধৃতাংশটুকু নেওয়া হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'ছাদ', প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (৪)গ্রন্থ থেকে। প্রথম সংস্করণ—১৯৯৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা - ৫২৬।

১৬. সাহিত্য অকাদেমির Indian Literature - এ প্রকাশিত প্রবন্ধটির শিরোনাম 'Absorbing Concentration ' উদ্ধৃত অংশটুকু নেওয়া হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'বাড়ি বদলে যায়', প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (৬) গ্রন্থ থেকে। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা — ৫০১।

১৭. 'স্বার্থ', প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (৬)— রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা — ৫০২।

১৮. 'বনপলাশির পদাবলী', প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (৪)— রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ—১৯৯৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ৫২৪।

১৯. 'বনপলাশির পদাবলী', উপন্যাস সমগ্র (৪)— রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ-১৯৯৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা —৯।

২০. 'লজ্জা', উপন্যাস সমগ্র (১)— রমাপদ চৌধুরী। চতুর্থ মুদ্রণ— জানুয়ারী ১৯৯২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ৬৯।
২১. 'পরাজিত সম্রাট'। তদেব। পৃষ্ঠা— ৩৩৭।
২২. 'ডুবসাঁতার', উপন্যাস সমগ্র (৫)— রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ— ১৯৯৪। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা — ৪৫৩।
২৩. 'মানুষের সংসার'—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ—২০০২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ৯।
২৪. 'খারিজ', উপন্যাস সমগ্র (১)—রমাপদ চৌধুরী। চতুর্থ মুদ্রণ—জানুয়ারী ১৯৯২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৬৫।
২৫. 'সুন্দরম', গল্পসমগ্র (২)—সুবোধ ঘোষ। চতুর্থ মুদ্রণ—জুন ২০০৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—১৪৬।
২৬. 'গোত্রান্তর', গল্পসমগ্র (২)—সুবোধ ঘোষ। চতুর্থ মুদ্রণ—জুন ২০০৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—১২৩।
২৭. 'বীজ', প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (১)— রমাপদ চৌধুরী। চতুর্থ মুদ্রণ— জানুয়ারী ১৯৯২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ৪৩৬–'৩৭।
২৮. 'ভূমিকা', উপন্যাস সমগ্র (১)—রমাপদ চৌধুরী। চতুর্থ মুদ্রণ—জানুয়ারী ১৯৯২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৩।
২৯. 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়। চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৪। রত্নাবলী। কল—৯। পৃষ্ঠা—২০৫।
৩০. তদেব। পৃষ্ঠা—২০৮।
৩১. 'বাঙ্গালা ভাষা', বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম কামিনী সং,জানুয়ারী ১৯৯১। কামিনী প্রকাশালয়। কল—৯। পৃষ্ঠা—৩৭৩।
৩২. 'উপন্যাসের ভাষা', সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। প্রথম প্রকাশ,জানুয়ারী ২০০৩। দে'জ পাবলিশিং। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—১৬৯।
৩৩. 'ঋষি,দস্যু,এক কিশোর বালক',গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১। এবং মুশায়েরা। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—৫১।
৩৪. 'সহযোগ',গল্পসমগ্র—রমাপদ চৌধুরী। দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। পৃষ্ঠা—১২।
৩৫. 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া, গল্পসমগ্র—রমাপদ চৌধুরী। দ্বিতীয় সংস্করণ। দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। পৃষ্ঠা—৩৯৭।
৩৬. 'প্রথম প্রহর', উপন্যাস সমগ্র (২)—রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। পৃষ্ঠা—১১৭।
৩৭. 'আনন্দমঠ', বঙ্কিম রচনাবলী, উপন্যাস সমগ্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিংশতিতম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১০। সাহিত্য সংসদ। কল—৯। পৃষ্ঠা—৬৫৪।
৩৮. 'ঋষি,দস্যু,এক কিশোর বালক',গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১। এবং মুশায়েরা। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—৫১।
৩৯. 'লালবাঈ', উপন্যাস সমগ্র (৫)—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ,জুন ১৯৯৪। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। পৃষ্ঠা—১৭২।
৪০. 'প্রসঙ্গকথা', 'বনপলাশির পদাবলী', উপন্যাস সমগ্র (৪)—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। পৃষ্ঠা—৫১৮-'১৯।

৪১. এখনই', উপন্যাস সমগ্র (৩)— রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১২ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ৬৪।
৪২. 'পিকনিক', উপন্যাস সমগ্র (২)—রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ২৫৩।
৪৩. 'শেষের সীমানা', উপন্যাস সমগ্র (৩)—রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। পৃষ্ঠা—৩৯৭-৯৮।
৪৪. 'কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প'—রবিন পাল। প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৪। চ্যাটার্জী পাবলিশার্স। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—৬।
৪৫. তদেব।
৪৬. 'স্বার্থ', উপন্যাস সমগ্র (৬)—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। পৃষ্ঠা—১৮৬।